ISSN: 3006-449X INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 1, March, 2024

রবীন্দ্র-উপন্যাস: নারীর প্রগতি, নারীর অধিকার

(Tagore's Novels: Progress and Rights of Women)

Dr. Md. Manzur Rahman
Professor, Department of Bengla, Islamic University, Bangladesh.
Corresponding Author: Dr. Manzur Rahman, manzurproma@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: রবীন্দ্রনাথ, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী, নারী, উপন্যাস

Received: 19, February
Revised: 29, February
Accepted: 11, March

©2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International.

ABSTRACT

পৃথিবীর সকল দেশের সমাজেই নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক-পূর্ব যুগের সাহিত্যেও নারীচরিত্রের ভূমিকা ছিল। সমাজে নারীর স্থান নিয়ে পৃথিবীর মহৎ চিন্তকদের মতো রবীন্দ্রনাথও ভেবেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাই বিবিধ ধারায় প্রকাশিত হয়েছে নারীর প্রেম, বৈভব, পরাভব, ব্যর্থতা, মুক্তি, অধিকার ও প্রগতি। তিনি উপন্যাসে বিধবা, সধবা, প্রণয়ি, খল ইত্যাদি ভূমিকায় নারীর জীবনাচরণের কথা, অর্থাৎ তার চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, দ্রোহ-বিদ্রোহ, বাদ-প্রতিবাদ, প্রগতি ও অধিকার চেতনার কথা সমাজবাস্তবতা ও আধুনিকতার নিরিখে তুলে ধরেছেন। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী উদার মানবতার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ নারীকে আপন ভাগ্য জয় করে নেবার অধিকার বিধাতাপুরুষের কাছে প্রার্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে নারীদের দেখেছেন, দেখেছেন বাইরের জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম নারীদের। তাঁর স্বাভাবিক মানবিক যে মনটি ছিল, যে অপরিমিত সহানুভূতি ছিল, তা দিয়ে এ সমাজে নারীর হেয় ও অপমানিত অবস্থানকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। আর করেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী ধরে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে, মানবিকতাবোধের ক্ষেত্রে নারী সমাজের অগ্রগতি ও জাগরণের পরিচয় পাই। রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীর বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা কেবল নারীর প্রগতি ও অধিকার চেতনার প্রসঙ্গটিই এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করতে চেয়েছি।

এক

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) একচ্ছত্র সম্রাট, সিদ্ধিদাতা গণেশ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। মহাকাব্য ছাড়া সাহিত্যের এমন কোনো শাখা অবশিষ্ট নেই যেখানে এই প্রণম্য মহাজনের স্বর্ণহাতের স্বর্ণস্পর্শ লাগেনি। সাহিত্যের যে শাখায় তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনার ফসল ফলেছে। তাঁর মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য আধুনিক হয়ে ওঠে, পরিচয় ঘটে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও জীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সমস্ত পৃথিবী ও ভারতবর্ষে তখন প্রবলভাবে আধুনিকতার ঢেউ লেগেছে। নতুন কালের মানুষ নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে পাশ্চাত্য নবজাগরণের চেতনা, অন্যদিকে সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণ-প্রসূত প্রগতির ঢেউ, সমকালীন এ দুটি ঘটনা রবীন্দ্র-মানস গঠনে কাজ করেছে সংগোপনে।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে নবজাগরণ যুগের মানসিকতা ব্যক্তিমানসের বিকাশে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের যে বিজয় ঘোষিত হয়েছিল, মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে তা এনেছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন। ধনতন্ত্রের বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল প্রকৃতি ও ঈশ্বরের উপর মানুষের জয়। এ সময় নারীর আইনগত অধিকার, শিক্ষা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, নাগরিক অধিকার (বিশেষত ভোটাধিকার) বিশেষ স্থান লাভ করে। রবীন্দ্র-মন ও মনন এ নতুন যুগের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়। এ কালপর্বকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকেন্দ্রিক উৎপাদন থেকে শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদনের প্রাধান্যের যুগ কিংবা নরনারী নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের মানসমুক্তির যুগ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে এসে নারীর প্রগতির সংগ্রাম নতুন মাত্রা পায়। রামমোহন-বিদ্যাসাগর যুগের সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আরো প্রসরিত হয়। সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয় । হিন্দুদের বিধবাবিবাহ প্রথা আইনসিদ্ধ হয়। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে। নারীদের সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নটাও সামনে চলে আসে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারিত হয়। সামান্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলো জনমানসের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারীদের মধ্যে একাংশ শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের পথে অগ্রণী হয়ে আসে। নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের সংগ্রামে বাংলায় ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্রণী নারীরা সংগঠিত হতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেও নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে নারীরা অনেকেই যোগ্য অংশগ্রহণ করে। নারী জাগরণের এই ভাবনা রবীন্দ্র-মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং কথাসাহিত্যে নারীর অধিকার ও প্রগতির ভাষ্যনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

দুই

নারী জাগরণের পূর্বে নারীর সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক। তৎকালীন হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান ছিল একেবারেই নিম্ন পর্যায়ে। এ সময় সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার মতো সামাজিক ব্যধিগুলো মহামারী আকার ধারণ করে। মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত দাহ হবার জন্য উৎসাহ দেবার পেছনে

পুরুষশাসিত সমাজের বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধিই কাজ করে। স্বার্থবিজড়িত এ ঘৃণ্য মানসিকতার উপর ধর্মীয় প্রলেপ দেবার জন্যই নারীদের পতিপরায়ণতার চরম আদর্শ হিসেবে সতীদাহ বা সহমরণে উৎসাহিত করা হয়। এ সামাজিক অবস্থানে নারীসমাজ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল– কুমারী, সধবা নারী ও বিধবা নারী। কৌলিণ্য প্রথা প্রবল থাকায় নারীর কুমারী কাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। গৌরিদান বা আট বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। তা না হলে পিতা-মাতাকে সমাজ থেকে পতিত হতে হতো। মেয়ের বয়স আট হয়ে গেলেই বাব-মা যে কোনো প্রকারে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে জাতি রক্ষার জন্য উদগ্রিব হয়ে উঠতেন (রহমান ২০০৮ : ১৬)।' এজন্য আশি বছরের বৃদ্ধকেও জামাই করতে পিতা মাতা এতটুকু দ্বিধা করতো না। মেয়ের বয়স এবং স্বগোত্রে পাত্র পাওয়া নিয়ে তারা সবক্ষণ শঙ্কিত থাকতো। এ প্রসঙ্গে নারীর অতীত অবস্থার একটি বর্ণনা–

> একই পাত্রে বহু কন্যার কুমারীত্ব খণ্ডন করবার জন্য নির্ধারিত করতে লাগল। পাত্র শিশু হোক, বৃদ্ধ হোক, মেয়েকে নিয়ে ঘর করুক বা নাই করুক সে প্রশ্ন অবান্তর। বিবাহ করে কন্যার কুমারীত্ব মোচন করলেই পিতার কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায়। ফলে পরিস্থিতি যা হয় তা একান্তই অবাঞ্ছনীয়, বিবাহিত মেয়ে পিতৃগৃহে একরকম বিধবার জীবনই যাপন করতে লাগল (বন্দ্যোপাধ্যয় ১৯৮৭: ৬৬।

গৌরিদান ও কৌলিণ্য প্রথার কারণে সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে যায়। 'বালিকার বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিবাহ অথবা কুলীনের বহুবিবাহ সমাজে শুধু নারীকেই বঞ্চিত করেনি, সমাজে নানা অন্যায় ও ব্যভিচারের পথকে প্রশস্ত করেছে (হাসান ১৯৯০ : ২০)।' বাল্যবিবাহের ফলে নারী বিধবা হলে তার পুনরায় বিয়ে ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু বয়স ও যৌবনধর্মের চাহিদায় সব সময় সংযত হতে না পারায় ঘটতো নানা অঘটন। সে অঘটনের দায় বইতে হতো একা নারীকেই। কারণ গর্ভসঞ্চারের সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণ ফুটে ওঠে কেবল মেয়েদের শরীরেই। সেখানে নির্দিষ্ট পুরুষের কোনো সাক্ষ্য থাকে না। এর পরিণাম– নারীর সমাজচ্যুতি ও পতিতাবৃত্তি গ্রহণ।

যে বয়সে একটি মেয়ের বিয়ে হতো, তখন তার পুতুল খেলার বয়স। সে বুঝতো না বিবাহিত জীবনের গূঢ় রহস্য। স্বামী তার কাছে অচেনা বস্তু, সংসার এক অজানা জগৎ। সংসারে বোবা জন্তুর মতো ছিল তার বসবাস। স্বামীর ঘরে পাঠানোর আগে তাকে শেখানো হতো– পতিই পরম গুরু, পতি দেবতা, তার পায়ের তলায় স্বর্গ। ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণুতাই মেয়েদের আদর্শ, যত রকম অন্যায়-অত্যাচার হোক না কেন তা মুখ বুজে সহ্য করাই নারীর ধর্ম। সেই শিশু বয়সেই মেয়েদের মন এমন নীতিবাক্যের ভারে পঙ্গু করে দেওয়া হতো (রহমান ২০০৮ : ১৭)।' তার উপর ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। বাল্যবিধবার অভিশাপ থেকে যুক্ত হয়ে সধবার জীবন উপভোগেও নারীর কোনো গৌরব ছিল না। কুলীন জামাতা একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। সারাজীবনে যতো নারীকে সে বিবাহ করেছে, তাদের সকলের নাম ও মুখ তার স্মরণে নেই। কখনো কোনো সময়ে অর্থের আবশ্যক হলে জামাতা শ্বশুর বাড়ি আসতো। অর্থপ্রাপ্তির পর পুনরায় অন্যত্র গমন (হাসান ১৯৯০ : ৫১)'। সুতরাং কুলিন কন্যাকে সধবা হয়েও বিধবার মতোই জীবনযাপন করতে হতো। জীবনে হয়তো এক বা দুবার সে স্বামীর মুখ দেখতে পেতো। তাছাড়া ঘরে একাধিক সতীন থাকাও বিচিত্র কিছু ছিল না। স্বামীর বহুবিবাহের সঙ্গে রক্ষিতা পালনও ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। রক্ষিতা নারীকে স্বতন্ত্র বাড়ি তৈরি করে দেওয়া ছিল গৌরবের কাজ। পুরুষ যতই বহির্মুখী আচরণ করুক না কেন নারীর একনিষ্ঠতা ছিল প্রশ্নাতীতভাবে কাম্য। সংসারে নারী আক্ষরিক অর্থেই ভোগের সামগ্রি। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

> বিবাহিত জীবনে নারীকে পশুরও অধম বলে গণ্য করা হয়। বাড়ীতে তাকে দাসীর মত খাটানো হয়। তার কাজ হলো বাসন মাজা, ঘর মোছা, দুবেলা রান্না করা। রান্নায় কোন ত্রুটি হলে স্বামী ও শাশুড়ি তাকে গালিগালাজ করে। খাওয়া হয়ে গেলে উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট যা

> থাকে তাই দিয়ে তাকে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। স্বামীর অর্থবল থাকলে স্ত্রীর চোখের সামনে সে রক্ষিতা পোষণ করে। যেখানে স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে, সেখানে তার সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয় (হাসান ১৯৯০: ৪০)।

কুমারী ও সধবা নারীর জীবনের চিত্র যদি এই হয়, তবে সহজেই অনুমেয় যে বিধবার অবস্থা কি করুণ ছিল! তখনকার দিনে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় তারা বাবা, ভাই, পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতো। বিধবাদের উপর খাওয়া ও চলাফেরার ছিল হাজার রকমের বিধিনিষেধ। ফলে সমাজে তারা প্রায় অদৃশ্য ও একঘরে। তাদের জন্য আনন্দ-উল্লাস করা ছিল অতি নিন্দনীয় ব্যাপার। অন্যের সংসারে তাদের অবস্থান ছিল দাসীর চেয়েও করুণ। দাসীর তবু কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু অসহায় বিধবা নারীর সেটুকু স্বাধীনতাও ছিল না। লোভী পুরুষের কামনার্ত দৃষ্টি থেকে অনেক বিধবাই রেহাই পেতো না সেদিন, কিন্তু পরিণাম ভুগতে হতো বিধবা নারীকেই।

নারী সমাজের এই অবর্ণনীয় দুর্দশা মোচনের জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন। তিনি সমাজে ও ধর্মে নারী যে নিষ্ঠুরভাবে শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে তা উপলব্ধি করলেন। সমাজ ও ধর্ম নারীর উপর কল্যাণের নামে যে অন্যায় অধিকার চাপিয়ে দিয়েছে, তার উপর প্রথম আঘাত হানেন রামমোহন। মুলত তাঁরই প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইন (১৮২৯) পাস হয়। এরপর রামমোহনের পথ অনুস্মরণ করেন বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বিধবা নারীর দুর্দশায় তিনি বিচলিত হন। তাঁর চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগর এখানেই থেমে থাকলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন, নারীর এ দুর্দশার জন্য দায়ী অশিক্ষা আর আপন অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা। এবার নারীশিক্ষার আয়োজন হলো। মেয়েদের শিক্ষার জন্য খোলা হলো স্কুল । ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো নেটিভ স্কুল, পরবর্তীকালে যার নামকরণ হয় বেথুন স্কুল। এরপর যাঁরাই নারীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন, তাঁরাই প্রতিপক্ষের শক্ত বাধার সম্মুখীন হন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালিসমাজ নারীমুক্তির লক্ষ্যে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষিত বাঙালিসম্প্রদায় উপলব্ধি করল, জাতির উন্নতির জন্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার খুবই প্রয়োজন। নারী জানতো না মানুষ হিসেবে তারও পুরুষের সমানাধিকার রয়েছে। এ জগতের বিরাট কর্মযজ্ঞে তারও রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ আসন। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর এ সকল বিষয়ে উপলব্ধি জন্মাল। নারীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে নতুন রূপে স্থান পেতে শুরু করল নারী। আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা শুরু হলো উনিশ শতকের নারীকে। সমাজে পুরুষের অনাচার, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিণাম নির্দেশ করে সাহিত্যিকেরা কলম ধরলেন। নারীর প্রতি মমত্ব নিয়ে ঔপন্যাসিকেরা নারীশক্তি অবিষ্কারের চেষ্টা করতে শুরু করলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত এবং ঠাকুর বাড়ির পুরুষসহ অনেক উদার হৃদয়ের মানুষের সাহায্যে ধন্য হলো নারীমুক্তির এই আন্দোলনের ইতিহাস (রহমান ২০০৮ : ২১)।'

এই আন্দোলন ও শিক্ষাগ্রহণের পরও নারীর অবস্থান সুদৃঢ় নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রামমোহনের মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলনের যে সূচনা, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও সে আন্দোলনের উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়নি। নারীর এখনো অবহেলিত, অনাদৃত। এখনো তারা সমাজে পূর্ণ অধিকার নিয়ে সমাসীন নয়। যে কাজের শুরু মহৎ হৃদয়ের মুষ্টিমেয় পুরুষ করে গিয়েছিলেন, সে কাজের ভার নারী নিজের কাঁধে তুলে নিল। একই সঙ্গে নারী তার এ কর্মযজ্ঞ পালনে অধিকারের সীমায়তন নিয়ে জড়িয়ে পড়ল বির্তকে। নারীর মুক্তির অর্থ কি পুরুষ হয়ে ওঠা? পুরুষকে চ্যালেঞ্জ করা? নিশ্চয় না, সেটা হওয়া উচিৎ নয়। আসলে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ও অত্যাচারিত নারীসমাজ নির্যাতনে যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবার ফলে এখন অনেকের মনেই পাল্টা প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগে উঠেছে। নারী আর নারী হয়ে থাকতে চাইছে না। নারী

জন্মকে ধিক্কার দিয়ে পুরুষ হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু পুরুষ হয়ে ওঠার মধ্যে নারীর কোনো গৌরব নেই। 'বায়োলোজিক্যাল' কারণে নারী ও পুরুষের দেহগত পার্থক্য ও নিঃসৃত হরমোনের প্রতিক্রিয়ায় তাদের মানসিকতায় ভিন্নতা রয়েছে। স্রষ্টার খেয়াল বা ইচ্ছা যায়-ই বলি না কেন, এ পার্থক্য মেনে না নিয়ে উপায় নেই। নারী বা পুরুষ তাদের নিজস্ব পরিচয়ের আগে উভয়েই মানুষ। বিশ্বের মানবসন্তান। তাদের মনুষ্যত্ব সমানভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। পুরুষের যেমন রয়েছে পৌরুষ, নারীর তেমনি নারীত্ব। তাই বায়োলোজিক্যাল পার্থক্য মেনে নিয়ে বলা যায়, নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। নারীকে নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে নিজ অধিকার প্রশ্নে সচেতন থাকতে হবে (রহমান ২০০৮ : মুখবন্ধ)।' এ পথেই একদিন নারী মূল্যায়িত হবে তার পরিপূর্ণ রূপ ও স্বরূপ নিয়ে।

তিন

বাংলা সাহিত্যে নারীর উপস্থিতি প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই লক্ষ করা যায়। কাব্যনির্ভর মধ্যযুগে কবিরা নারীচরিত্র সৃষ্টিতে অসামান্য পারদর্শিত দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের প্রায় সব কবিই পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে নারীর প্রতি বিদ্যমান শাসন, সামাজিক প্রথা ও অত্যাচার তাঁদের কবিসত্তায় সহমর্মিতার চেতনা সৃষ্টি করেছে। সমাজশক্তির শাসনাঘাতে প্রতিহত নারীর যন্ত্রণা আর শক্তি কবিদের রচনায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ সকল কবিরা নারীর দুঃখ ও যন্ত্রণা বর্ণনায় যতটা আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, ততটা-ই উদাসীন নীরব থেকেছেন তাদের অধিকার ও প্রগতির প্রশ্নে। মধ্যযুগের কাব্যে কোনো কোনো নারীচরিত্র অধিকারের প্রশ্নে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ সামান্য উঁকিঝুঁকি মেরেছে সত্য, কিন্তু তা খণ্ডিত অবয়বে, সগর্ব ও সরব উপস্থিতিতে নয়। এর জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আধুনিক যুগ, বিশেষ করে উপন্যাস সৃষ্টিকাল পর্যন্ত।

উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যে গদ্য আবির্ভাবের কিছুকাল পরেই উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। কাহিনি ও চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত উপন্যাস আধুনিক জীবনের মহাভাষ্য। উপন্যাস সমাজ-বাস্তবতারই দর্পণ। যে সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যাত্রা শুরু, তখন থেকেই ঔপন্যাসিকগণ সমাজের মূল্যবোধ, আন্দোলন এবং জীবনবাস্তবতার ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ কিংবা বহুবিবাহ সমস্যা বিংশ শতাব্দীতে হয়তো ছিল না, তারপরও নারীর স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ছিল উপেক্ষিত। এ উপেক্ষার প্রশ্নে অনেকেই তাঁদের উপন্যাসে নারীর অধিকার মূল্যায়ন করেছেন। মধুসূদন থেকে শুরু করে বাঙালি নারীর স্বাতন্ত্র্যের যে শুভ সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে এসে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল। নারী আপন বিশ্বাসে, আপন শক্তিতে প্রমাণ করল– সে প্রথমত মানুষ, তারপর নারী।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীর প্রগতি ও অধিকার নিয়ে আলোচনার পূর্বে প্রাক-রবীন্দ্র পর্বে নারীর রূপ ও স্বরূপ অনুধাবন করা প্রয়োজন। এ পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। তিনিই সার্থক উপন্যাসের জন্মদাতা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো নারীকেন্দ্রিক। কিন্তু সেখানে নারীর প্রগতি ও অধিকার-চেতনা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি, নারী খণ্ডিত অবয়বে উপস্থিত হয়েছে। বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষতন্ত্রের কাছে নারীকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। ফলে নারী আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মসচেতন হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের একটি মন্তব্যটি– 'নারীর স্থান অন্তঃপুরে; পিতা, স্বামী এবং পুত্রের সেবা পরিচর্যায় জীবন উৎসর্গ করাই নারীর ধর্ম। সতীত্ব এবং মাতৃত্বের দ্বারাই নারীর মূল্য নিরূপিত। জীবনের আলাদা ক্ষেত্রে সাধনা এবং সার্থকতা অর্জন নারীর পক্ষে অসাধ্য এবং অনাকাঙ্ক্ষিত (রায় ১৯৯২ : ১৪৫)।'

বঙ্কিমচন্দ্রও নারীকে এই ঘেরাটোপরে বাইরে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। হিন্দু নারীর সতীত্বের প্রতি আনুগত্য, স্বামীর স্মৃতির প্রতি যুক্তিহীন নির্ভরতা, সংসারধর্মে একনিষ্ঠতা নারীর অবশ্যকর্তব্য বলেই ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ কারণেই তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো নারী হয়েই থেকেছে, মানুষ হতে পারেনি। কুন্দ-রোহিনী নির্বাসিত হয়েছে সমাজ-বিচারকের কাঠগড়ায়। শিল্পীর ভূমিকা ছেড়ে জাতির শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঙ্কিম রোহিনীর পদস্খলন ঘটালেন আর কুন্দ-কুসুম অকালে ঝরে গেল। *চন্দ্রশেখর'র* (১৮৭৫) শৈবালিনীও শিক্ষক বঙ্কিম, নীতিবাদী বঙ্কিমের হাতে অপদস্ত হয়েছে। *দেবী চৌধুরানী'র* (১৮৮৪) প্রফুল্লও কঠোর পরিশ্রম করে শেষ ফল লাভ হয়েছে সতীনের সঙ্গে ভাগাভাগির কারবারি করে। এও সম্ভব হয়েছে সমাজশিক্ষকের জন্যই। এ পর্বে রমেশ দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাসে নারীচরিত্রের নিজস্বতা বলতে কিছু নেই, তারা সবাই সমাজের ক্রীড়ানক। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই স্তরের বাইরে যেতে পারেননি। শরৎচন্দ্রের বিধবাদের প্রতি মমত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও তাদের কারোর প্রেমই সার্থক হয়ে ওঠেনি। তাঁর সৃষ্ট বিধবারা প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করার ভিতরই মহত্ত্ব খুঁজে পেয়েছে। বিধবার প্রেম ব্যর্থ হয়েছে সমাজের চাপে অথবা অন্য কোনো কুমারী নারীর আগমনে। এসব বাধা তুচ্ছ করার মতো মানসিক শক্তি তারা অর্জন করতে পারেনি। সাবিত্রী, কিরণময়ী, রমা, মনোরমা– এরা কেউই তাদের প্রেম সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ তাদের স্রষ্টা অবচেতন মনে হিন্দু-ঐতিহ্যের সনাতন সতীত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রের বিপুল কথাসাহিত্যের কোথাও একটা বিধবার বিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র যদিও জানতেন উপন্যাস সমাজতত্ত্ব নয়, নিছক শিল্পমাত্র, তবু তাঁর উপন্যাসে সমাজের প্রবল প্রতিপত্তি। ব্যক্তি প্রায়ই সমাজের চাপে পরাভূত হয়েছে। *পল্লীসমাজ'র* (১৯১৬) রমা সমাজের চাপে রমেশের প্রতি তার প্রেম প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছে। সাবিত্রী সমাজের জন্য সতীশকে বিয়ে করতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীরও একই সমস্যা। সমাজ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সমাজের অযৌক্তিক বাধা থেকে উত্তরণের পথ তিনি দেখাননি বরং সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় নারী আপোষ করতে বাধ্য হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ভাবাবেগের প্রাধান্য প্রবল। তাঁর উপন্যাসে নারী যুক্তির বদলে আবেগের বশে চলতেই বেশি পছন্দ করেছে (রহমান ২০০৮ : ২৬)।' *গৃহদাহ'র* অচলার আচরণে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে আবেগই স্বর্বস্ব। কিরণময়ীর আচরণে অকাট্য যুক্তি নেই। পূর্বাপর চিন্তা না করেই সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। তাঁর উপন্যাসে নারীর পরম কর্তব্য সেবাপরায়ণতা। অসুস্থ পুরুষকে সেবা এবং তার মুখে আহার তুলে দেওয়ায় যেন নারীর একমাত্র কর্তব্য। হৃদয়বান অকমর্ণ পুরুষের প্রতি তার হৃদয়ের টান। সে টানে যুক্তির লেশমাত্র নেই। অবশ্য শরৎচন্দ্র নারীর প্রায় সব রকম সমস্যাই তুলে ধরেছেন। কিন্তু সে সমস্যা শুধু ব্যক্তিক সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত রয়ে গেছে, সমগ্রতায় পৌঁছেনি। শরৎচন্দ্র নারীকে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে দেখেছেন। নারীকে তিনি পুরুষের মতো আলাদা মানুষ হিসেবে দেখেননি। নারী তাঁর কাছে মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন বা অন্য সামাজিক সম্পর্কিত ব্যক্তি। সে নারীজাতি, মানবজাতি নয়। সে জন্য নারীমুক্তি বা নারীর অধিকারের প্রশ্ন যখনই তাঁর উপন্যাসে এসেছে, তা হয়ে গেছে আরোপিত। সেখানে নারীচরিত্রের প্রাণের কথা প্রকাশ পায় না, মনে হয় লেখকের মতবাদের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে চরিত্রটি। নারী তার অধিকারে নিজেই সচেষ্ট হবে, এমন বিশ্বাসেও তিনি বিশ্বস্ত নন। পুরুষ ন্যায়বান হয়ে কৃপা করে নারীকে বিচার করবে, এটাই তিনি আশা করেন। সে জন্যই 'নারীমুক্তির ব্যাপারেও তাঁর আবেদন পুরুষজাতির সহানুভূতি ও ন্যায়ধর্মের প্রতি (সিকদার ১৯৮৮ : ৪৭)।' শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে সব নারী তেজস্বী, তারা সবাই আপন সংসার ও পরিচিত বলয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বলয়ের বাইরে তাদের চলাফেরা, চিন্তাভাবনার কোনো পরিচয় নেই। তারা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস পায়

না। এ জন্য তারা আপোষ করে। পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নারীদের মতো তারা প্রতিবাদী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নারীরা তাদের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যতটুকু সচেতনতা দেখিয়েছে, শরৎচন্দ্র উত্তরসূরি হয়েও তা দেখাতে পারেননি।

চার

রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীদর্শনের পূর্বে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নারীর অবস্থান দেখে আসা জরুরি। কারণ নারী নিয়ে রবীন্দ্র মানসগঠনে ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা* গ্রন্থে ঠাকুরবাড়ির অন্তরমহলের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, তখন নারী ও পুরুষের মহল ছিল স্বতন্ত্র। মেয়েদের গতিবিধি ছিল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে তাদের জীবন ছিল সীমিত। এর বাইরে যাওয়া মানে কালেভদ্রে গঙ্গাস্নান আর আত্মীয় কুটম্বের বাড়িতে বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছেলেবেলা* গ্রন্থে বলেন–

> আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায় ...। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা দরজাবন্ধ পালকিতে হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। ... ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ তেমনি বাইরে বেরোবার পালকিতেও। বড়ো মানুষের ঝি-বউদের পালকির উপর আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেরাটোপের। দেখতে যেন একটা চলতি গোরস্থান।

নারীদের প্রতি এই সাবেকি ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*-এ তিনি লিখেছেন– 'সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তাহলে তাঁর দানের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।'

বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন উদার ও সংস্কারমুক্ত মানসিক পরিমণ্ডল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নারীদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেও নারী শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কোনো রকম কার্পণ্য ছিল না। কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও মেঝো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে শেষ পর্যন্ত বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী ভেঙেছিলেন কঠোর পর্দাপ্রথা। তাঁর কন্যা সৌদামিনীকে পাঁচ বছর বয়সে ১৮৫১ সালে হিন্দু ফিমেল স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। ঘরে সদ্য আগত বালিকা বধুদের ইংরেজি-বাংলা শেখাবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন শিক্ষক। এমনকি লরোটো স্কুলেও তাঁদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী তখনকার দিনে স্বনামধন্য লেখিকা। রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরেই তিনি উপন্যাস রচনায় বিখ্যাত হন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে উপলব্ধি করে এলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার অপরিহার্যতা। ন'দাদা হেমেন্দ্রনাথ বাড়ির মেয়ে-বৌদের নিয়ম করে লেখাপড়া শেখাতেন। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শোনাতেন দেশ-বিদেশের ভালো ভালো গল্প। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে দুই দাদা– সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রভাব যথেষ্ট, বিশেষ করে স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং নারীর অধিকারের প্রশ্নে। অন্যদিকে বোন, বৌদি এবং বেশ কিছু নারীর সহচার্যও তাঁকে নারীর অধিকারের প্রশ্নে সচেতন হতে সাহায্য করেছিল। বৌদি কাদম্বরী দেবী, আন্না তড়খড় এবং পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনে, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও বিদেশে তিনি বেশ কয়েকজন সংস্কারমুক্ত নারীর সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সকল নারীও নারী-অধিকার প্রশ্নে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। দাম্পত্যজীবনে সম্পর্ক স্থিতিশীল, সুখী ও অর্থবহ করার জন্য স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদার উপর রবীন্দ্রনাথ সব সময় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরস্পরের শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথ আমৃত্য স্ত্রীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন। মৃণালিনী দেবী তাঁর থেকে বয়সে, শিক্ষায় ও মেধায় অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্ত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীমুক্তির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা বিস্ময়করভাবে সর্বাধুনিক (রহমান ২০০৮ : ৩২)।' বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 'য়ুরোপ প্রবাসীর অষ্টম পত্রে' তিনি লেখেন– 'বিয়ের মন্ত্র ভালবাসা জন্মাবার যন্ত্র নয়, বিয়ে হলেও ভালবাসা হয় না।' পুরুষ বিয়ের মন্ত্র পড়েই ধরে নেয় স্ত্রী তার সম্পত্তি। স্ত্রী ভালোবাসায় তার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু সে অধিকারকে যে অর্জন করতে হয়, তা সে জানে না।

নারীশিক্ষা প্রগতি ও অধিকার চেতনার সহায়ক শক্তি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমস্ত জাতির শিক্ষাই যে শুধু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাই নয়, ছেলেদের শিক্ষাকেও ব্যর্থ করে দেবে। শিক্ষিতা নারী সচেতন হবে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হবে। তাঁর মতে, নারীশিক্ষা এমন হওয়া দরকার যাতে নারী নিজেকে পুরুষ নয়, মানুষ ভাবতে শেখে, নারী পুরুষ হবার সাধনা করুক তা তিনি কামনা করেননি। তার ভেতরে যেন নারীত্বের মাধুর্য ও অধিকার চেতনার প্রাচুর্য থাকে। নারী লালিত্য ও মাধুর্য বজায় রেখেই তিনি চেয়েছিলেন নারীর স্বাতন্ত্র্য অর্জনের অধিকার ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। রবীন্দ্রমানসে নারীর প্রিয়ারূপ ও মাতৃরূপের সম্মেলন ঘটাতে চেয়েছেন। তিনি নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক মনে করেন। নারী বা পুরুষ কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একে অন্যের সহযোগিতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-মানসে যে নারী আদর্শ, সে কোমলে-কঠোরে গড়া। সে যেমন ফুলের মতো কোমল, তেমনি অগ্নিশিখার মতো তেজস্বিনী (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯১ : ৫৭)।'

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গল্পে নারীর দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা অধিকাংশ কলেবর জুড়ে বর্ণনা করেছেন। এ সকল নারী বিদ্রোহ কিংবা প্রতিবাদ করার অবসর ও পরিসর পেয়েছে খুব কম ক্ষেত্রেই। তিনি নারীর অধিকার-চেতনা ও প্রগতির সবটুকু মেলে ধরছেন উপন্যাসে। বৃহৎ কলেবরের এ সাহিত্য শাখায় নারীকে নির্মাণ করেছেন নিজস্বচেতনা ও সমাজবাস্তবতাকে সামনে রেখে। এখানে নারী তার আপন স্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিত্বে, অধিকারে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে পূর্ণায়বয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বউ-ঠাকুরানীর হাট'র (১৮৩৩) বিভা রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রগতিশীল ও প্রথম প্রতিবাদী নারী। 'বিভাকে প্রথমাবধি স্বল্পভাষী একটি সর্বংসহা নারীরূপেই দৃষ্ট হয় (ভট্টাচার্য ২০১১ : ৭৯)।' সে পিতার স্বেচ্ছাচারী অন্যায়কর্মের প্রতিবাদ করতে না পরলেও পিত্রালয়ে স্বামীর সম্মান রক্ষায় দৃঢ়তা দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে তার অধিকার সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিভা স্বামী রামচন্দ্রের উদ্দেশে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হয়েছে। চন্দ্রদ্বীপের হাটে স্বামীর পুনর্বিবাহের ঘটনা ঘটতে চলেছে শুনে সে স্বামীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছে– 'আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।' নীরব ও নমনীয় বিভার এ জাতীয় সক্রিয়তায় তার মধ্যে প্রতিবাদী সত্তাটির পরিচয়ই স্পষ্ট হয়েছে। সে স্বামীকে প্রকারন্তে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়েছে। বিভার স্বামী বিয়ে করেছে। সে স্বামীর বিয়ে মেনে নিয়ে স্বামীর ঘরে নিগৃহীতের জীবনযাপন করতে পারতো, কিন্তু সে তা করেনি। স্বামীর অপমান ও অবহেলা তার ভেতরের স্বতন্ত্র সত্তাকে উদ্দীপ্ত করেছে। তাই স্বামীকে ত্যাগ করে আত্মসচেতন বিভা ভাইয়ের সঙ্গে কাশিবাসী হয়েছে। স্বামীর অবহেলা সহ্য করার চেয়ে সধবা হয়ে বৈধব্যের জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করেছে।

এ উপন্যাসে রুক্মিণী হিন্দু বিধবা। হিন্দু শাস্ত্র মতে, বিধবার কাউকে ভালোবাসা বা বিয়ের কথা চিন্তা করাও পাপ। কিন্তু রুক্মিণীর একথা একবারও মনে হয়নি। সে মনে করেছে, বৈধব্যদশা তার সৃষ্ট নয়, সুতরাং এর দায়ভার বহন করার দায়িত্বও তার নয়। বিশেষ করে, যেখানে স্বামীর কোনো স্মৃতিই তার নেই। সুতরাং যুবরাজ উদয়াদিত্যকে কামনা করায় তার মনে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব নেই, বরং যুবরাজকে অভিযোগ জানিয়েছে স্পর্ধাভরে– 'আমি কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমি তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী একদিন যুবরাজকে দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে, সে আজ ভিখারীর মত পথে পথে বেড়াইতেছে।'

রুক্মিণী তার প্রেম ও শরীর যুবরাজকে সমর্পণ করেছে। সুতরাং যুবরাজের স্ত্রী হবার অধিকার তার রয়েছে। সে শিক্ষিত ও সূক্ষ্ম মননের অধিকারী না হলেও সে তার অধিকার বোঝে। এ অধিকার আদায়ে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার অধিকার আদায়ের রাস্তা যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, এ বিষয়ে একটুও ছাড় দেয়নি সে ।

চোখের বালি'র (১৯০৩) বিনোদিনী শিক্ষিতা ও প্রখর বুদ্ধিমতী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারী। সে অধিকার সচেতন ও প্রগতিবাহী এক পরিপূর্ণ সত্তা। সে শুধু নারী নয়, এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণে মহেন্দ্র ও বিহারী দুই পুরুষের জীবনাচরণ প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ অধিকার ও আত্মসচেতন নারী এই বিনোদিনী। ঔপন্যাসিক তার মনোবৃত্তির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– 'সকলের সঙ্গে সমান সুবিধার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ... তার দাবী প্রতিষ্ঠার প্রবল ইচ্ছা তাকে এক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্বে ভূষিত করে। এই ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করা অসম্ভব (রায় ১৯৯৪: ৮৩)।'

বিনীদিনী রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তার বেঁচে থাকার জন্য চাই ভালোবাসা ও স্বীকৃতি, চাই অধিকার অর্জন। সে বিশ্বাস করে মহেন্দ্র তাকে অবহেলা করেই বিয়ে করেনি। অথচ কি নেই তার। পরবর্তীকালে মহেন্দ্র তাকে ভালোবাসলেও সে প্রত্যাখান করেছে। তার অবচেতন মনে সেই অবহেলার প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে ওঠেছে। বিনোদিনীর বিহারীর মতো ধীরস্থির ব্যক্তিত্বময় পুরুষই কাম্য। কিন্তু বিহারী বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, বরং তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে আশাকে রক্ষা করার জন্য। কারণ আশাকে সে ভালোবাসে। বিনোদিনী দেখেছে, সংসারে সবাই তাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। 'রাজলক্ষ্মী তাকে ব্যবহার করেছে পুত্রবধুকে জব্দ করার জন্য, মহেন্দ্র ব্যবহার করেছে নিজের উচ্ছৃঙ্খল ভালোবাসার জয় ঘোষণার জন্য, বিহারী ব্যবহার করেছে আশাকে রক্ষা করার জন্য (সেনগুপ্ত ২০১২ : ৪৪)।' এমনকি সরলা আশাও বিনোদিনীকে খাতির করেছে স্বামীর ভালোবাসায় বৈচিত্র্য আনার জন্য। কিন্তু বিনোদিনী প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী নারী। 'সে ব্যবহৃত হবার জন্য আসেনি।' সে চেয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আর সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই তার প্রয়োজন বিহারীর ভালোবাসা (মুখোপাধ্যায় ১৯৯০ : ১১৫)।' বিনোদিনীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পক্ষে মহেন্দ্রের মতো কাপুরুষকে, লঘু চিত্তের অস্থির পুরুষকে ভালোবাসা সত্যিই অসম্ভব। বিহারীর ব্যক্তিত্ব তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে। বিহারীকে ভালোবেসে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে। সমাজে সেও একজন মানুষ, ভাগ্যদোষে সে বিধবা। মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তারও জন্মগত। তার রূপ, গুণ থাকা সত্ত্বেও কেন সে হবে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিতা? এমনকি ভালোবাসার স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত সে পাবে না? একজন আত্মসচেতন ও প্রগতিশীল নারী হিসাবে এ কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে বিহারীর বিবাহিতা স্ত্রী হবার জন্য আকুল হয়নি, সে চেয়েছে বিহারীর প্রতি তার

প্রেমের স্বীকৃতি। হিন্দু সমাজরে বিধবা সে, একথা তার মনে নেই। ধর্মশাস্ত্র তার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। তাই দ্বিধাহীনকণ্ঠে বিনোদিনীর প্রশ্ন–

> ঠেকাইব কাহার জন্য। তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসার ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালের আমার সকল দাবী মুছিয়া ফেলিব। এত ভাল আমি নই– ধর্শশ্রাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে কী পাইব?

বিনোদিনীকে মহেন্দ্র না দেখেই উপেক্ষা করেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের পর সে ক্রমশ বিনোদিনীর অদৃশ্য সুতার টানে নিজেকে চালিত করেছে। শিক্ষিত আত্মসচেতন বিনোদিনী এটা কিছুতেই মেনে নেয়নি। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে তাঁর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছে। মহেন্দ্রকে সর্বক্ষণ উপেক্ষা আর অপমান করেও তার হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায়নি। আবার রাজলক্ষ্মী দ্বারা 'মায়াবিনী' শব্দটি শুনে বিনোদিনী কঠিন সত্যকে ভয়হীনভাবে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি– '... তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।'

মহেন্দ্রের বক্তিত্বহীনতায় বিনোদিনী তার প্রতি যেমন বিমুখতা প্রকাশ করেছে, তেমনি মহান পুরুষ বিহারীর ঔদার্য তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু বিহারীর বিনোদিনীকে দেওয়া বিবাহপ্রস্তাব তার প্রতি ভালোবাসার চাইতে বরং সহনুভূতিই প্রবল ছিল। এ রকম করুণার পাত্রী হবার মতো দুর্বল বিনোদিনী মোটেই নয়। তাই একদা তার চুম্বন-প্রত্যাশী-উদ্যত-ওষ্ঠকে অবহেলা করেছে যে বিহারী, তাকে শারীরিকভাবে আহত করেছে যে বিহারী, পদে পদে অবহেলা-লাঞ্ছনা করেছে যে বিহারী, তাকেও এক সময় সে ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রগতিশীল নারী তো এমনই হয়। বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর অবদমিত কামবাসনা আর প্রেমচেতনায় প্রগতিশীলতার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি নিজের পছন্দের পুরুষকে পুরোপুরি জয় করবার ভাবনাও ধরা পড়েছে। এই নারী, সন্দেহ নেই, একেবারে নতুন কালের আত্মপ্রত্যয়ী নারী।

নৌকাডুবি (১৯০৬) উপন্যাসের হেমনলিনী রমেশের প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত। রমেশ কমলাকে বিয়ে করে একত্র বসবাস করছে জেনেও হেম তার বিশ্বাসে অটল থেকেছে। আবার অক্ষয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী হেম তার প্রতি সচেতন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে। রমেশকে প্রকৃত ভালোবাসার জন্যই হেম নলিনাক্ষের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে কোনোরূপ উৎসাহ দেখায়নি। মানসিক শুচিতাবোধে সে রমেশকে জীবনে না পেলেও অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়নি। এ তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বেরই প্রমাণ। কমলা রমেশের অকারণ ঔদাসিন্যের আঘাতে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতার বেদনায় সে রমেশের কাছে নিজেকে উপযাচিকা করে তোলেনি বরং বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। রমেশের মুখের উপরে সে উদ্ধত স্বরে কথা বলতে দ্বিধা করেনি। এমনকি রমেশের খুলে রাখা দরজা সে সবেগে বন্ধ করে দিয়েছে। আবার নলিনাক্ষের কথা শোনার পর সে তার সঙ্গে অজ্ঞাতে রমেশের সাহচর্যের কথা অকপটে জানিয়েছে।

গোরা (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে সুচরিতা ধীর-স্থির-শান্ত হলেও সিদ্ধান্তে এবং অধিকারবোধে অনেক বেশি সচেতন। বাধ্য ও বিনয়ী সুচরিতা প্রয়োজনে কঠোর হতে জানে। তার প্রমাণ মেলে ললিতার বিয়ের সময়, হারাণবাবুকে উদ্ধত্যের স্পর্ধায় এবং হরমোহিনীর কৈলাশের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার সিদ্ধান্তের সময়। নিজ সিদ্ধান্তে সে সর্বক্ষণ স্থির থেকেছে। হারাণবাবু তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সম্মুখেই সে 'না' বলে দিয়েছে। আবার মাসি হরিমোহিনী নিজের দেবরের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিলে সুচরিতা তার আত্মসংবরণের প্রবল ক্ষমতায় মাসিকে

সরাসরি কিছু না জানিয়ে পরেশবাবুর আশ্রয় নিয়েছে। ললিতার মতো বিদ্রোহের ধ্বজা না তুললেও সিদ্ধান্তে সে অনমণীয়। ললিতার বিয়েতে যাবার ব্যাপারে হরিমোহিনীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সুচরিতা তার মত পরিবর্তন করেনি। সে পরদিন ঠিক সময়েই ললিতার নতুন বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে। হরমোহিনী যখন সুচরিতাকে ফিরিয়ে আনতে যায়, তখন সে নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে দ্বিধা করেনি। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি যখন আমাকে নিতে এসেছ তখন সকল লোকের সামনে তোমাকে অমনি ফিরিয়ে দেব না, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আজ দুপুর বেলায় আমি এখানে ফিরে আসব।' 'গোরা উপন্যাসে নম্রতার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির, শিক্ষার সঙ্গে দীপ্তির, নারীত্বের সঙ্গে আত্মমর্যাদার সংশ্লেষণ ঘটল (মজুমদার ১৯৮১ : ১২৫)।'

আত্মঅধিকার-সচেষ্ট প্রগতিশীলা হিসেবে এ উপন্যাসে ললিতা অনন্য চরিত্র। উনিশ শতকে যে স্বাধীনতার জোয়ার আসে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সৃষ্ট ললিতা যেন সেই ভাবধারায় স্নাত। সমাজের কিছু শ্রেণির স্বার্থে সৃষ্ট রীতিনীতিকে অবহেলা করার মতো যথেষ্ট মানসিক অনমনীয় তেজ তার মধ্যে রয়েছে। পিতা পরেশবাবুর শ্রদ্ধেয় চরিত্রের প্রতি তার শ্রদ্ধা গভীর। কিন্তু মাতা বরদাসুন্দরীর মানসিক স্থূলতায় সে তাঁর প্রতি বিরূপ। বিনয়ের প্রতি ললিতার প্রণয় অকৃত্রিম। বিনয় গোরার অন্ধ অনুকরণে সে বিরক্ত। একে বিনয়ের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা বলেই সে মনে করেছে। তাই বিনয়কে বলেছে– 'ওঁর বন্ধু ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেছেন যে উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। যেন কাচপোকায় তেলাপোকাকে ধরেছে। ... গৌরমোহনবাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়ে গেছে– সেটা দাসত্ব, সে ভালোবাসা নয়।'

ললিতা প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিত্বময়ী ও অধিকার সচেতন। বিনয়ের সঙ্গে একাকী প্রত্যাগমনে পরেশবাবুর অবাধ স্বাধীনতা দানকে হারাণবাবু দায়ী করলে, ললিতা বলিষ্ঠতার সঙ্গে জবাব দিয়েছে– 'আমাদের সম্বন্ধে বাবার কী কর্তব্য আপনি মনে করেন, বাবার চেয়ে আপনি তো ভালো বোঝেন। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনি হচ্ছেন হেড্‌মাস্টার।' ললিতার আত্মচেতনার আরও পরিচয় পাওয়া যায় তাকে বিয়ের জন্য বিনয়কে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনায়। বিবাহে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে কোনো বাধাস্বরূপ গ্রহণে সে অনিচ্ছুক। ধর্মের প্রাচীর অতিক্রম করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব– এই বিশেষ সত্য ললিতা অনুভব করেছে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃতি এবং মানবতাবাদী প্রেমধর্মের উপলব্ধি থেকে বিনয় যে পরিণতমনস্ক হয়েছে, তার দিশারী গোরা নয়, ললিতা। ললিতাই হাত ধরে জীবনের শুভ অর্থের উপলব্ধির দিকে বিনয়কে অগ্রসর করে দিয়েছে।

ললিতা অনেক বেশি প্রতিবাদী ও তেজস্বী। প্রতিবাদ জানাতেই সে মা-বোনদের ছেড়ে অনাত্মীয় পুরুষ বিনয়ের সঙ্গে স্টিমারে চড়ে কলকাতায় চলে আসে। ললিতা সমাজ বা বদনামের ভ্রূকুটিকে ভয় করে না। ম্যাজিস্ট্রেটের আতিথ্যে সে থাকতে পারেনি। তার সম্পর্ধিত উচ্চারণ– 'মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝিনে।' ললিতা নিজেকে মেয়েমানুষ মনে করে না, মানুষ ভাবে। সমাজের সব নিন্দার ঝড় সে প্রতিবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। সে মনে করে– 'মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাকবো? পৃথিবীর কোনো কাজেই লাগবো না?' বিনয়ের সঙ্গে তার ভালোবাসার কথা সে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেছে। সুচরিতা যখন বিনয়ের যোগ্য হবার জন্যে উপদেশ দেয়, তখন ললিতা অনায়াসে বলে– 'ইস ! তাই বৈকি! আর, আমার যোগ্য বুঝি কাউকে হতে হবে না।' বিনয়কে বিয়ের ব্যাপারে সমস্ত বাধা সে অগ্রাহ্য করেছে। সে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে– 'আমি হারানবাবুদের এই সমাজ থেকে মুক্ত হব।'

চতুরঙ্গ'র (১৯১৬) দামিনীর কাছে সমাজ এক নিষ্ক্রিয় প্রাণহীন বস্তুমাত্র। প্রগতিশীলা দামিনীর কাছে হৃদয়ধর্মই প্রধান। নিজ অন্তরে যে কথা সত্য বলে জেনেছে, সে মতো পথে চলতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি। দামিনী পরিপূর্ণভাবে জীবনকে

উপভোগ করতে চায়। মৃত স্বামী শিবতোষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিল না তার। সেখানে দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্নই ছিল প্রকট। স্বাধীন মনের অধিকারী বিধবা দামিনী বিশ শতকের রেনেসাঁরই ফসল। স্বামী শিবতোষের জীবিতকালে স্বামীর সঙ্গে মানসিক অসঙ্গতিতে সে সর্বদা স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ভূমিকাই নিয়েছে। মৃত্যুর সময় স্বামী তাকে গুরু লীলানন্দের চরণে সঁপে গেলেও প্রগতিশীল দামিনী জীবনকে বাদ দিয়ে ভক্তিতে মন বসাতে পারেনি। এমনকি গুরুর প্রতি প্রকাশ্যে অবহেলা করতেও দ্বিধা করেনি। সে চায় মানুষ হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা, মেয়ে মানুষ হিসাবে নয়। তার বেশভূষা, গমনাগমন বিধবার মতো নয়। বিধবা হয়েও শচীশকে ভালোবাসা জানাতে এতটুকু দেরি করেনি। দামিনী ভালোবেসেছে, ভালোবেসে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সে ইপ্সিত পুরুষকে খুঁজে পেতে চেয়েছে শচীশের মাঝে। তাই শচীশের সঙ্গ সে ছাড়েনি। বিধবা নারীর প্রেমে যে কলঙ্ক সমাজ লেপন করে, তা সচেতনভাবেই দামিনী উপেক্ষা করেছে। এ কারণে লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপী শচীশকে সে ভালোবেসে আত্মনিবেদন করেছে–

> 'আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত যত্ন করিতে পরেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেভানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকেই চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই ... তুমিই আমার গুরু। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস– যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।'

দামিনীর মধ্যে তেজ বর্তমান। গুরুজী তাকে সবিনয়ে আহবান জানালে সে তার সম্মুখেই 'না' উত্তর দিয়েছে। শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর অনুরূপ অনুভব করে শচীশ বিরক্তিতে দামিনীকে কোনো আত্মীয়-গৃহে বসবাসের কথা জানালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী দামিনী প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে– '... আমি কি তোমাদের দশ পঁচিশের ঘুটি?' দামিনী চরিত্রের মধ্যদিয়ে বিধবা নারীর প্রেম ও যৌনলীলার অস্তিত্ব নারীত্বের অনিবার্য অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। দামিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও যৌনস্বাধীনতাবোধের এ এক অনিবার্য প্রকাশ। প্রথা ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে প্রণয়ের দাবি প্রতিষ্ঠায় দামিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই শেষ পর্যন্ত শচীশকে না পেয়ে জীবন থামিয়ে দেয়নি, সমাজের কলঙ্ক ও ধর্মের অনুশাসন না মেনে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে। 'দামিনী বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল ও বিধবা বিবাহের অগ্রদূত (রায় ১৯৯৪ : ১৪০)।' দামিনী শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী। তার প্রতিবাদ স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি মনে করার বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ বিধবার জীবনের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়াকে জোর করে অবদমনের বিরুদ্ধে।

ঘরে বাইরে (১৯১৬) উপন্যাসের বিমলা চরিত্রটি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এক আধুনিক নারী। স্বামী থাকা সত্ত্বেও পরপুরুষ সন্দীপের প্রতি তার আকর্ষণ দেহগত নয়, মানসিক ও দর্শনগত। নিখিলেশের সংযত প্রেমে প্রগতিঋদ্ধ বিমলা পৌরুষের সন্ধান পায়নি। সন্দীপের মতো প্রেমের উত্তাপ সে নিখিলেশের মধ্যে অনুপস্থিত দেখেছে। আবেগমথিত হয়ে সন্দীপের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার আগে সে বলেছে–

> রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলাম, তার কাছে আমি কোথায় আছি।

এদেশের সামন্ততন্ত্রভিত্তিক সমাজের অবসান ও ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধিযুগের সন্ধিক্ষণে সংবেদনশীল এক নারীচরিত্র *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসের কুমুদিনী। দাদা বিপ্রদাসের দ্বারা উদার মানবতার মন্ত্রে সে দীক্ষিত। অকালে মাতৃহারা সংসারে খুঁটিনাটি বিষয়ে অনভিজ্ঞা কুমু নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাচীন সংস্কারগুলোর মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে তার বসবাস। দাদা বিপ্রদাসের সাহচর্যে তার মনস্তত্ত্বের বিকাশ সাধিত হয়েছে। দাদার রুচির সঙ্গে ক্রমশ নিজেকে এক করে নিয়েছে সে।

তাই প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনুগত্যে মধুসূদনের সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপনকালে বাম চোখ কাঁপা শুভলক্ষণ বিবেচনায় সে সহজেই এতে মত দিয়েছে। এমনকি বিবাহোৎসবে অপ্রীতিকর ঘটনা তথা মধুসূদনের কুরুচিকর আচরণ সত্ত্বেও সে জোর করে হলেও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বজায় রাখতে চেয়েছে। তবে অসচেতনভাবেই কুমুর মনে যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছে, তার প্রকাশ কিছুকাল পরেই পাওয়া যায়। বিবাহের প্রাক্কালে মধুসূদন বিপ্রদাসের নিষেধে বন্ধ হওয়া পাখি শিকারেই যেতে উদ্যত হয়েছে। চন্দনদহের বিলে মধুসূদন শিকারে যাবে, কিন্তু কুমু তার দাদাকে দৃঢ়ভাবে অনুরোধ জানিয়েছে স্বামীকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু বিপ্রদাস কোনো অশান্তিতে যেতে চায় না বুঝে কুমু বলেছে- 'তা বুঝুক ভুল। মান-অপমান শুধু ওদের একলার নয়।' কুমুদিনী শ্বশুরালয়ে গমনের প্রাক্-মুহূর্তে নিজেকে আন্তরিকভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বিবাহিত জীবনে নীলার আংটি সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে মধুসূদনের সঙ্গে তার প্রথম বাধে। যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তার পরচিয় দিয়ে সে আংটি খোলে না। 'স্বামী' সত্তাটির প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়েও সে ব্যর্থ হয়। কারণ 'প্রগতিশীলা কুমু প্রকৃতই শ্রদ্ধা করতে পারে রুচিশীল, সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিমনস্ক একটি মানুষকে– যা তার স্বামীতে অনুপস্থিত (চট্টোপাধ্যায় ২০০৯ : ২৮)।' তাই সে স্বামীর প্রতি সচেতনভাবে ঔদাসীন্য পোষণ করেছে। স্বামীর দাসীরূপে স্ত্রীর অবস্থানের বিষয়টি তার পক্ষে যথেষ্ট অমর্যাদাকর। এ কারণে স্বামীর স্থূল প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ– 'এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।' সত্যিই কুমুকে মধুসূদন কখানো পায়নি। মধুসূদনের দ্বারা অপমানিত কুমু স্বামীশয্যা ত্যাগ করে। কারণ-আত্মিক মিলন ব্যতীত স্বামীর সন্তানের জননী হবার সম্ভাবনা তার কাছে অপমানকর। এ যেন উনিশ শতকের নবজাগরেণের ফল, আধুনিক নারীর অধিকার আদায়ে স্পষ্ট উচ্চারণ।

কুমুদিনী প্রখর ব্যক্তিত্বে আত্মচেতনাময়ী এক নারী। আত্মমর্যাদা রক্ষায় সে অনমনীয়তা প্রকাশ করেছে। কুমুদিনীকে কোনোভাবেই আয়ত্তে আনতে সক্ষম না হয়ে মধুসূদন শেষপর্যন্ত তাকে দাদার নিকট প্রেরণ করেছে। সেখানেই কুমু তার মাতৃত্বের লক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। সমাজের প্রতি দায়ে তথা শিশুটির পিতৃপরিচয়ের সুনিশ্চয়তা দান করতে কুমু তার সন্তান অথাৎ ঘোষাল বংশের ভাবী উত্তরাধিকারকে ফিরিয়ে দিয়ে আসার জন্যই শুধু শ্বশুরবাড়িতে ফিরতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু দাদার অপমান সে কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তাই আসন্নপ্রসবা কুমু দাদা বিপ্রদাসকে বলেছে– 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।' এখানেই রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার চূড়ান্ত আধুনিকতা। কুমু ফিরলেও তার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন– 'আমি তাদের বড়ো বউ, তার কি কোনো মানে আছে, যদি আমি কুমু না হই?' এ প্রশ্ন দাদার কাছে নয়, এ প্রশ্ন সমাজের কাছে, ধর্মের কাছে– যে সমাজ নারীকে মাতৃত্ব ও সতীত্বের মোহে আবৃত করে রেখেছে। এ সমাজ নারীকে ভুলিয়েছে এই বলে যে, তোমরা ব্যক্তি নও, মানুষ নও; তোমরা মা, তোমরা স্ত্রী। মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের জন্য তোমাদের স্বাধীনতা এবং অধিকার বিসর্জনই মহত্ত্বের লক্ষণ। সমাজ তাতে বাহবা দেবে। 'কুমুদিনীর এই আত্মঘোষণা, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের এই সংগ্রাম, আত্মঅন্বেষণের এই আন্তরিক বিশ্লেষণ তাকে দিয়েছে এক অসামান্যতা (মুখোপাধ্যায় ১৯৯০ : ১২১)।' এখানেই নারীর আত্মচেতনার স্বীকৃতি, পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিরূপী স্বামীদের প্রতি প্রতিবাদের অঙ্গুলি উত্তোলন। কুমু স্বামীর ঘরে গেছে আবার ফিরে আসার প্রত্যাশা বুকে নিয়েই। সে দাদাকে বলেছে, 'একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব, চলে আসবই এ তুমি দেখে নিও।' নিজের স্বকীয়তা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে বলেই কুমু এমন স্পর্ধায় বলতে পেরেছে– 'মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারবো না।'

শেষের কবিতা'র (১৯২৯) লাবণ্য প্রকৃত শিক্ষার স্পর্শে মানসিক সমৃদ্ধিতে ঋদ্ধিময়ী। পিতার অনুগত ছাত্র শোভনলাল যে তার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত, তা অনুভব করেও লাবণ্য তাকে উদাসীনভাবে অবহেলা করেছে। শোভনের পিতা শোভন-

লাবণ্যের বিষয় নিয়ে লাবণ্যর পিতা অবনীশ দত্তকে অপমান করলে লাবণ্যর শোভনলালের প্রতি অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে পিতার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন লাবণ্য জীবিকার কারণে শিলং-এ এসে অমিতের সাক্ষাৎ পায়। অমিতের প্রচণ্ড আকর্ষণীয় ক্ষমতায় সে প্রথমে তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হলেও অমিতের কাব্যিক উচ্ছ্বাস-তারল্য সে লক্ষ করে। অমিত যে 'সংসার ফাঁদবার মানুষ' নয় প্রগতিশীলা লাবণ্য সহজেই বুঝতে সমর্থ হয়েছে। শেষপর্যন্ত স্থিতপ্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তে লাবণ্য বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে শোভনলালের সঙ্গে। সে অমিতকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে সহজভাবে, বিদায় দিয়েছে প্রশান্ত মনে। অমিতকে ছাড়তে গিয়ে লাবণ্য মানসিকতায় ভেঙে পড়েনি। অমিত ও লাবণ্যের সামাজিক দূরত্ব তাদের দাম্পত্য জীবনের সমস্ত মাধূর্য নষ্ট করে দেবে ভেবে লাবণ্য অমিতকে প্রগাঢ়ভাবে ভালোবাসলেও ঘর বাধেনি। যে জীবন পূর্ণ মর্যাদার এবং অধিকারে মহিমান্বিত হতে পারবে না, সে জীবন লাবণ্যের কাম্য হতে পারে না। লাবণ্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবতাকে বিচার করেছে। অমিতকে ভালোবাসায় লাবণ্যের কোনো মনঃস্তাপ নেই। অমিতকে ভালোবেসেই সে শোভনলালের যোগ্য সহধর্মিণী হতে পেরেছে। যুক্তিবাদী লাবণ্যের ধারণা– 'বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না। বিয়ে করা মানে স্থিত হয়ে বসা। আর ভালোবাসা ক্রমাগত পথ চলার মতো।'

দুইবোন (১৯৩৩) উপন্যাসের শর্মিলা অধিকারবোধসম্পন্ন এক নারীচরিত্র। তার মধ্যে রয়েছে স্নিগ্ধ অথচ প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। নৈনিতাল ভ্রমণে যাবার পথে তাদের রিজার্ভ করা আসন বেদখলের চেষ্টাকারী দুজন ইংরেজকে হটিয়ে দেওয়ার ঘটনা তারই প্রমাণ দেয়। শর্মিলার স্বামী শশাঙ্ক মৌলীর সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরির পদোন্নতিতে তার স্থলে অন্য একজন ইংরেজ যুবকের অধিষ্ঠিত হওয়ার অপমানজনক ঘটনায় শর্মিলাই তাকে চাকুরি ত্যাগের প্রেরণা যুগিয়েছে। শর্মিলার মানসিকতার অন্যতম দিক তার প্রগতিচিন্তা ও অধিকারচেতনা। এর বলেই সে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। শশাঙ্ক চাকুরি ছেড়ে দিলে শর্মিলারই কষ্ট হবে জানালে শর্মিলা তাকে বলেছে– 'তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।' মানসিক স্থৈর্য ও ঋজুতা তাকে স্পষ্টবাদীতা দান করেছে। এ উপন্যাসের ঊর্মিও প্রগতির স্বাক্ষরবাহী নারীচরিত্র। ঊর্মি শাশঙ্ক-শর্মিলার প্রস্তবে সম্মত হতে পারেনি। এ প্রস্তাব ঊর্মির জন্য মর্যাদাকর নয়। যেখানে অধিকারবোধ খণ্ডিত সেখানে তার পরাভব স্বীকারে অস্বীকৃতি। ঊর্মি মর্যাদা নিয়েই বোনের সংসার থেকে চলে গেছে।

মালঞ্চ (১৯৩৩) উপন্যাসের নিরজা প্রগতিশীল ও স্বাধিকার চেতনাসম্পন্ন নারী। স্বামীর বাল্য বান্ধবী সরলা স্বামী ও স্বামীর সাজানো বাগান অধিকার করে নিয়ে যাচ্ছে শুধু তার দৈহিক অসমর্থের কারণে, এটা মেনে নেওয়ার নারী নিরজা নয়। তাই স্বামীকে লক্ষ করে তার স্পষ্ট উচ্চারণ– 'এই অর্কিডের ঘর শুধু তো তোমার আমার, ওখানে সরলার কোন অধিকার নেই।' নিজের স্বতন্ত্রসত্তা প্রতিষ্ঠায় সে মরণপণ সংগ্রাম করে গেছে।

চার অধ্যায়'র (১৯৩৪) এলা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। সে বিদ্রোহিনী। এলার শুরু থেকেই যুক্তিগ্রাহ্য মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মায়ের শুচিবায়ু দেখে তার যুক্তিবাদী মনটি এভাবে প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার করেছে– '... এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে; এ তো কেবলই যন্ত্রের মতো অন্ধভাবে মেনে চলা।' বিয়ের পরিবর্তে সে বিদ্যার্জনকে প্রাধান্য দিয়েছে। তার মনে ধারণা জন্মেছে, 'বিয়ের জন্য মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে। ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।' অতীনকে সে প্রথমে রাজনীতির জন্য দলে টানলেও, ক্রমেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালোবেসেছে। তার দুর্বার ভালোবাসা কখনো গোপন করার চেষ্টা করেনি। এলা স্বেচ্ছায় নিজের দেহ-মন তুলে দিয়েছে প্রেমিকের হাতে। শুধু তা-ই নয়, 'মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে বলেছে, 'মারো

এইবার মারো'। এ যেন প্রেমিকের কাছে আধুনিক নারীর অলজ্জ প্রকাশ। *চোখের বালি*'র বিনোদিনীর যে অসমাপ্ত চুম্বন বিহারীর কাছ থেকে ফিরে এসেছে, এলা তা সাহসিকতার সঙ্গে সমাপ্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রগুলোও প্রাগ্রসর চিন্তায় ও অধিকারের প্রশ্নে পিছিয়ে নেই। এ প্রসঙ্গে *নৌকাডুবি* উপন্যাসের ক্ষেমাংকরীর নাম উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসে নলিনাক্ষের মা ক্ষেমাংকরী প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী। স্বামী রাজবল্লভ ত্রিশ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু ক্ষেমাংকরীকে স্বামীর সমধর্মের ভাগিনী হবার মানসিক সংস্কার পেয়ে বসেনি। তিনি বরং সতর্কভাবেই সমস্ত আচার-বিচার সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। আবার বৃদ্ধ বয়সে স্বামী একটি বিধবাকে বিবাহ করায় ক্ষেমাংকরী দৃঢ়ভাবেই তাকে ত্যাগ করে কাশীযাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বামীকর্তৃক অপমানকে নিতান্তই উপেক্ষা করে তিনি পুত্রকে সঙ্গে করে কাশীযাত্রা করেছেন। স্বামীর সঙ্গে কোনোমতেই সমঝোতা না করে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সৃষ্ট এই প্রবীণা, স্থিতধী নারীটি যেভাবে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাকে আত্মসচেতন ও অধিকার সচেতন নারী না বলে পারা যায় না। *গোরা* উপন্যাসের আনন্দময়ীর নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আনন্দময়ী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিনয় ও ললিতার বিয়ে দিয়েছে। সংসারের সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে বিচার করেছেন। *শেষের কবিতা*'র যোগমায়াও সব কুসংস্কারের উর্ধ্বে। লাবণ্যের জীবনে অমিতের আগমনকে তিনি নিঃসংকোচে স্বাগত জানিয়েছেন।

ছয়

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ কখনো নারীকে খণ্ডিত অবয়বে দেখেননি। তিনি পুরুষ ও নারীকে আলাদা করেননি। রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্রের কার্যকলাপ দেখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে। তাদের কার্যকারণের পাপ-পূণ্যের বিচার নিজের হাতে তুলে নেননি। তিনি নারীকে দেখেছেন সমাজ-নিরপেক্ষ, নীতি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে। এজন্যই তাঁর উপন্যাসে নারীরা আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মগরিমায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। নারীর মূল্যায়ন কেবল মাতৃত্বে কিংবা স্ত্রীত্বে নয়, মনুষ্যত্বে- এ কথা প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন রবীন্দ্রনাথ, বিশেষত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে। তাঁর হাতে নারী এই প্রথম ব্যক্তিত্বশীলা হয়ে উঠে। পরিশেষে বলা যায়, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার যে বীজটি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বপন করেন, তা মহিরূহরূপে বিকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে।

REFERENCES

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র অধ্যয়ন*, (কলকাতা: চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিঃ, ১৯৯০), পৃ. ১১৫

প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭

দীপন চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র চেতনায় নারী চরিত্র*, (কলকাতা: অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ২৮

দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী, *তুলানার প্রেক্ষিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র উপন্যাস–নারী-মনস্তত্ত্ব*, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪), পৃ. ৪০

বদরুল হাসান, *নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস*, (কলকাতা: জগৎমাতা, ১৯৯০), পৃ. ২০

প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ৫৭

বিশ্বজীবন মজুমদার, *রবীন্দ্র উপন্যাস: দেশ ও কাল*, (কলকাতা: পপুলার লাইব্রেরি, ১৯৮১), পৃ. ১২৫

রণেন্দ্র নারায়ণ রায়, *ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ*, (কলকাতা: দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৪), পৃ. ৮৩

প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

শাহীদা রহমান, *রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর অধিকার চেতনা*, (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৮), পৃ. ১৬

প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

প্রাগুক্ত, পৃ. মুখবন্ধ

প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়ক নায়িকা*, (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১২), পৃ. ৪৪

শিবনারায়ণ রায়, *রেনেসাঁস*, (ঢাকা: শিল্পতরু, ১৯৯২), পৃ. ১৪৫

সুতপা ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারী*, (কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১১), পৃ. ৭৯

সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, (ঢাকা: ঢা.বি. ১৩৮৮), পৃ. ১২৩

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলন*, (কলকাতা: বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, ১৯৮৭), পৃ. ৬৬